জেমস জয়েস থেকে শিবনারায়ণ

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

''আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।'' এটা শুধু রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের জ্যাঠামশাই চরিত্রের মুখের কথা নয়, একেবারে বুকের কথাও বটে। উক্তিটির ভিতর নানা প্রশ্নের সম্ভাবনাও আছে। যাঁরা অনেক কিছু মানেন তাঁরা নিজেকে কতটা মানেন? আর সব কিছুই মেনে নিলে প্রশ্নই-বা থাকে কী? সবই কি আত্মসমর্পণে প্রীতিকর হয়ে যায় না? তবু কি দুর্মর নচিকেতা যমের কাছে প্রশ্ন করেনি, 'আত্মা কী?' হিন্দু শ্রাদ্ধবাড়িতে যখন কঠোপনিষদ পাঠ করা হয় তখন তা শুনে কি অনুষ্ঠানে সমাগতজনরা আত্মার স্বরূপ অবগত হয়ে নিজ নিজ মৃত্যু সম্বন্ধে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হন? এই সবচিন্তা মনে এল শিবনরায়ণ রায়ের স্বদেশ স্বকাল স্বজন গ্রন্থটি পড়তে পড়তে। গ্রন্থটি আসলে তেরোটি প্রবন্ধের সংকলন এবং এগুলির মধ্যে চারটি পুরোপুরি নিজের বিষয়। কিন্তু রম্যারচনামূলক তো নয়ই, এমনকি আত্মস্মৃতিমূলকও নয়, যদিও নিজের কথা, লেখকের কথা, লেখকের পরিবারের কথাও বহুবার এসে গেছে। এখানে 'নিজের বিষয়' কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথও নাস্তিক চরিত্রের উক্তিটির মধ্যে 'নিজেকে মানিবার' দায়ের উপর জোর দিয়েছেন।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো' আর প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বলেছিলেন, 'আত্মাকে বিদ্ধ করো'। উক্তিগুলির মধ্যেই দুটি পক্ষের স্বীকৃতি আছে, একজন বলেছেন আর অপরজন শুনেছেন, একজন গুরু আর অপরজন শিষ্য, একজন কর্তৃত্ব আর অপরজন আনুগত্য। এই অবস্থাটা নাস্তিকের পক্ষে আদৌ গ্রাহ্য নয়, নাস্তিক কারও কর্তৃক মানে না, মানে শুধু নিজেকে। ''বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু, এই নিয়ে তাহার গৌরব। লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত। সত্যেরে সে পায় আপন আলোতে ধৌত অন্তরে অন্তরে।'' আর এই জন্য নাস্তিক বারবার আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে দেখে আর প্রশ্ন করে ''আমি কে?'' এখানে আর কোনও পক্ষ নেই, শুধু এক পক্ষ, শুধু নিজে, শুধু আমি। কিন্তু নাছোড়বান্দা নচিকেতা প্রশ্ন করতে পারে, ''আমাকে জানা আর আত্মাকে জানা কি একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ?'' এবং আমরাও জানতে চাইতে পারি যে 'নিজে' আর 'আমি' আর এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে তিন-তিনবার ব্যবহৃত 'স্ব' কি একই ব্যঞ্জনাদ্যোতক?

দায়িত্বহীনভাবে শিথিল অর্থে শব্দ প্রয়োগের জন্য তাঁর বিচারকালে সোক্রেতিস সরকারি পণ্ডিতদের যে-সমালোচনা করেছিলেন তাকে এক কথায় প্রকাশের জন্য বাংলায় 'পণ্ডিতমূর্খ' বলে একটা কথা আছে। সোক্রেতিসের মতো শিবনারায়ণও প্রযুক্ত শব্দের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয়ের ব্যাপারে একান্ত তন্নিষ্ঠ। সেজন্য ইংরেজিতে self শব্দটির সঙ্গে জড়িত দ্যোতনাকে বিবেচনা করে তিনি 'সেল্‌ফ্' -এর বাংলা করেছেন 'প্রতিস্ব'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন individualism-এর বাংলা 'প্রাতিস্বিকতা' করেছিলেন তখন তার মধ্যেই 'প্রতিস্ব' কথাটি গুপ্তরূপে ছিল। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের বাংলা প্রতিশব্দ শিবনারায়ণ অকাতরে গ্রহণ করেননি, তাই individuality অর্থে 'ব্যক্তিতা' personality অর্থে 'অস্মিতা' শব্দদুটি চয়ন করেছেন। তাৎপর্য পরিস্ফুটনের পাশাপাশি একই সঙ্গে তিনি আত্মা বা soul, প্রতিস্ব বা self, ব্যক্তিতা বা individuality এবং অস্মিতা বা personality ভাবসত্ত্বগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেও বুঝতে চেয়েছেন। ঠিক অর্থে ঠিক শব্দ প্রয়োগ নিয়ে শিবনারায়ণের এত উদ্বেগের কারণ বোধহয় এই যে মানুষের চিন্তা অনিবার্যভাবেই শব্দকে অবলম্বন করে বিকশিত ও প্রবাহিত হয় এবং শব্দের অবলম্বনহীন চিন্তারাশি আসলে কুয়াশাগ্রস্ত অনাথপ্রতিম মানসিক দশা। সেজন্য শিবনারায়ণ তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসার জন্য ক্রমাগত যথার্থ শব্দ অন্বেষণ, নির্বাচন ও নির্মাণ করে চলেছেন। এবং ওইসব শব্দকে হাতিয়ার করে অধীত বিদ্যা ও আপন প্রজ্ঞার গভীরে এগিয়ে গেছেন। তাঁর এই অগ্রগমনের পেছনে আছে যুক্তির পারম্পর্য এবং যুক্তি-বিচারই তাঁর নাস্তিক্যের মূল্য নিহিত প্রযোজনা। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। পঞ্চভূতে প্রত্যাবৃত্ত হবার আগেই ব্যক্তির আপজাত্য আশঙ্কা থেকে আর্থার কোয়েসলার যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা শিবনারায়ণের কাছে সম্মানার্হ মনে হয়েছে, কিন্তু ওইবাবে মৃত্যুবরণ কি নাস্তিক্যের শক্তি সম্যকরূপে প্রমাণ করে? যেভাবে প্রাণত্যাগ জৈন জীবনাদর্শ -সম্মত যেভাবে প্রাণধারণের উপায়রূপী খাদ্যপানীয় ইত্যাদি থেকে আত্মপ্রত্যাহার কি আরও উচ্চস্তরের নাস্তিক্যের প্রমাণ নয়? কোয়েসলার আত্মঘাতে মৃত্যু মনোনয়ন করেছিলেন, কিন্তু আলবেয়ার কামু তো কিছু মনোনয়ন করার সুযোগই পাননি, দুর্ঘটনার অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই অন্তিম পরিণামের প্রসঙ্গটি থেকে আমরা অস্তিত্বের স্বরূপ যতটুকু বা যতখানি উপলব্ধি করি ততটাই লাভ। প্রতিস্ব-র তথা প্রতি মানুষের সত্তার 'আমি' বলে একটা রূপে থাকে যা প্রত্যক্ষ, যা চেনা, যা সহজ, কিন্তু সেই রূপের আড়ালে থাকে নাকি বিপুল নক্ষত্রগ্রন্থির অনন্ত অন্ধকার এবং কেউ কেউ সেই অন্ধকারে মর্ম থেকে স্বনিত আহ্বান শুনে উতলা হয়ে ওঠে নাকি অজানা অদেখা পথে অভিযানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে? 'নাস্তিকের মৃত্যুচিন্তা' তেমনই এক বিরল ব্যক্তির মনসম্ভবী দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী।

শিবনারায়ণ রায় সর্বদাই পাঠকের সামনে এক প্রতিস্পর্ধ ছুঁড়ে দেন। কে যাবে চলো আমার সঙ্গে। তাঁর সহযাত্রীকে থাকতে হবে সারাক্ষণ সচেতন, সর্বদা সচেষ্ট, সর্বথা সজাগ। এইটেই তার সহযাত্রীর ভবিতব্য এবং এই

যাত্রায় সমর্থন অবান্তর অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সহমত না হলেও চলে। কিন্তু তাঁকে অধ্যয়ন করাই এক অভিনব অভিজ্ঞতা। অভ্যস্ত চিন্তাভাবনার মসৃণতা ও প্রশান্তির পরিবর্তে যাত্রাপথ হবে প্রশ্নে প্রতিবাদে পরিকীর্ণ, আঘাতে সংঘাতে জর্জরিত। যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল, যেমন জাঁ পল সার্ত্র, যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় চমকে চমকে উত্তেজক নয়, চিন্তনে মননে উদ্দীপক, সূর্যোদয়ের মতো মনের দিগন্তকে উদ্ভাসিত ও প্রসারিত করে তোলে। মনে পড়েছে বর্তমান আলোচকের স্কুল ও কলেজের তথা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে হাতে পড়েছিল হলদেটে রঙের আলোছায়া। সে-বই নিশ্চয়ই বহু তরুণকে হাত ধরে জেমস জয়স, এজরা পাউন্ড প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর মহান ব্যক্তিদের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর এই দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই শিবনারায়ণ বিতর্কের ঝড় তোলেন গোয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করে। সেই বিতর্কের অন্তরালে গুপ্ত ছিল এক গূঢ় প্রশ্ন : ভক্তি আর শ্রদ্ধা কি একই মানসিকতার প্রকাশ? তখন থেকেই শিবনারায়ণ রায় স্বাক্ষরিত রচনাবলি মানে জাগরণ ও সতর্কতা, জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক, বিচার সন্ধান।

শিবনারায়ণের বিশ্লেষণ ও বক্তব্য আমাদের মনঃপূত হোক চাই না হোক এ কথা মানতেই হবে তিনি আধুনিক মনীষার এক অনন্য অভিব্যক্তি। বলে নেওয়া ভালো যে এখানে 'আধুনিক' বলতে 'একালের' নয়, এখানে 'আধুনিক' একটা চেতনা বা সংজ্ঞা। এই আধুনিক কোনও ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত দেশ নয়, মানুষের লিখিত ইতিহাসের কোনও নির্বাচিত অংশে নিবদ্ধ কাল নয়, কোনও বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সমপ্রদায় বা গোত্র বা বংশ সম্পর্কিত পাত্র নয়, সর্ব দেশে সর্ব কালে সর্ব জনে এই আধুনিকের বাস। এই আধুনিক একাধারে বিশেষণ ও বিশেষ্য পদবাচ্য। স্বদেশ স্বকাল স্বজন গ্রন্থের নাম প্রবন্ধটিতে যে-প্রতিস্বর পরিচয় আমরা পাই সেই প্রতিস্ব প্রকৃতপক্ষে দর্পণে প্রতিফলিত শিবনারায়ণ রায়ের অস্মিতার বিশদ ও বিদগ্ধ বিবরণ। এই প্রবন্ধটি পাঠকালে ওই প্রতিবিম্বের পেছনে দেখতে পাই আরও অনেক ছায়ামূর্তির আনাগোনা যাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সহজেই চেনা যায়, যেন গোয়টে যিনি ১৮২৭ সালে এক শীতের সন্ধ্যায় বলেছিলেন যে জাতীয় সাহিত্যের দিন যাচ্ছে আর এগিয়ে আসছে বিশ্ব-সাহিত্যের দিন। যেমন রামমোহন যিনি ১৮৩১ সালে লিখেছিলেন যে সমস্ত মানবতা এক বৃহৎ পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যেমন মার্কস যিনি ১৮৪৪ সালে প্যারিসে উপলব্ধি করেছিলেন যে একই মানবসমাজ দেশে দেশে যুগে যুগে দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, কোয়েসলার, আঁদ্রে মলরো যিনি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, এলিয়ট, সিটওয়েল, এলেন রায় প্রমুখ। শিবনারায়ণের বিশ্ববোধ কান্ট বা শোপেনহাওয়ের মতো দার্শনিক ভাবনায় বিমূর্ত নয়, বরঞ্চ স্পর্শ-দৃষ্টি-শ্রুতি-গ্রাহ্য বহু বিচিত্র সূত্রাবলিতে এবং অধ্যয়নের ও অনুভবের বহু বিনিদ্র অভিজ্ঞতায় এক অনন্য স্থাপত্য। এবং গ্রন্থের এই মূল বিষয়টিকে বিস্তৃত করেই তিনি যেমন এক দিকে একালে বিস্তৃত অসাধারণ বাংলা উপন্যাস শৈলবালা ঘোষজায়া রচিত শেখ আব্দু নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন তেমনই অন্য দিকে অনেকগুলি সার্থক উপন্যাসের লেখক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কবি মাডরুরু নারোজিন রচিত ডলউররা (চুয়াল্লিশটি কবিতাতরঙ্গে ওই নামের অস্ট্রেলীয় পাখির বিশ্ব পরিক্রমার কাহিনী), নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্যারিবিয়ান নাট্যকার ও কবি ডেরেক ওয়ালকট রচিত মহাকাব্য ওমেরস (অনেকগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে হোমের আর ওয়ালকটের সাক্ষাৎ ও সংলাপের এবং সেভন-সীজ নামে পরিচিত দৃষ্টিহীন ওমেরের আর ওয়ালকটের নরক ভ্রমণের অংংশ থেকে যে-দুটি উদ্ধৃতি শিবনারায়ণ দিয়েছেন শুধু সেটুকু পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয়) এবং পশ্চিম আফ্রিকা তীরবর্তী ঘানার লেখক কোয়ামে অ্যান্টনি আপপিয়া রচিত ইন মাই ফাদার্স হাউস নামক আত্মকাহিনী (যার আদর্শিকায় প্রতিফলিত হয়েছে আফ্রিকার সর্বজনীন জীবন ও সংস্কৃতি, যন্ত্রণা ও সংকট) প্রভৃতি গ্রন্থের গভীর পরিচয় সন্ধান করেছেন। এই সন্ধানই শিবনারায়ণের স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজন সধান। স্বজন সন্ধান করতে করতেই শিবনারায়ণ পৌঁছে যান এডিথ সিটওয়েলের সকাশে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইংরেজি কাব্য প্রসঙ্গে আগেও তিনি সিটওয়েলের আলোচনা করেছিলেন। পরে নিজেই বুঝতে পারেন যে তখন তিনি এই অসাধারণ ইংরেজ কবির প্রতি সুবিচার করেননি। এই গ্রন্থে গৃহীত সিটওয়েলের উপর তাঁর নতুন আলোচনাটির সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক অংশ হল দুজনের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন। এলিয়ট সম্বন্ধে দু পক্ষের মতভেদের গভীরে থমকে আছে গূঢ়তর কাবজিজ্ঞাসার ঝড়। রেস্টোরেশন যুগের দুই প্রধান কবি ড্রাইডেন আর পোপ, প্রথম জনকে এলিয়ট আর অপর জনকে সিটওয়েল প্রথম মহাসমরোত্তর কালে নতুন করে বিখ্যাত করেন। তবুও এলিয়টের প্রতি সিটওয়েলের প্রকট বিরূপতার কারণ কী? শিবনারায়ণের সন্দেহ, মনস্তাত্ত্বিক গূঢ়ৈষা। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভিঘাতে কাব্য রচনার যে-মানদণ্ড সিটওয়েল ধার্য করেছেন সেটিকে কবুল করলে সত্যিই কি এলিয়ট আর পাউন্ডকে সমান সমাদরে গ্রহণ করা সম্ভব? পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে অনবদ্য ভাষার সূক্ষ্ম শৈলীতে প্রকাশ করার কৃতিত্বে এবং ভাবুকতার এক অভিনব অভিব্যক্তিতে ফোর কোয়ার্ট্রেটস-এর কবি এলিয়ট অতুলনীয়। এলিয়ট প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, পক্ষান্তরে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সত্ত্বেও পাউন্ড নিতান্তই কবি, আপাদমস্তক কবি, সিটওয়েলের কথায়, ''পাউন্ড ভূমধ্যসাগরতীরের পাহাড়তলি— ফুলে উজ্জ্বল, ফলে নম্র, অপচয়ে উদার।'' এলিয়টের অনুরাগী শিবনারায়ণ অর কথা বাড়াননি। কিন্তু সিটওয়েলের উপর এই আলোচনার শেষে সিটওয়েলের একটি পুরো কবিতা তিনি উদ্ধার করেছেন, The War Orphans, এবং নিজেই কবিতাটি সম্পর্কে 'মর্মস্পর্শী' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। এই বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল

আলোচনাটি পড়ে আমি বুঝেছি যে কাব্য সম্পর্কে এডিথ সিটওয়েলের প্রথম ও প্রধান শর্ত—কবিতা প্রজ্ঞার আবাহন নয়, মর্মের আলোড়ন। সুতরাং সিটওয়েল এলিয়ট মিলবেন কোন্ সত্ত্বে?

শুধু রেস্টোরেশন কবিদের গুণগ্রাহিতায় নয়, ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আকর্ষণেও সিটওয়েল এবং এলিয়টের মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান। সিটওয়েল ১৯৫৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। এলিয়টও ক্যাথলিক হন, কিন্তু সিটওয়েলের মতে এলিয়ট আসলে অ্যাংলো-ক্যাথলিক। এ রকম মানুষকেই আমার বাংলায় বলি 'বর্ণচোরা আম'। জাপানে পরমাণু বোমা নিক্ষেপের জন্য এডিথ সিউওয়েলের তীব্র প্রতিক্রিয়া তাঁকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করে। জানতে ইচ্ছে করে যে এপিসকোপালিয়ান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অনুমোদনে এবং ক্যালভিনিস্ট ব্যাপটিস্ট ট্রুম্যানের আদেশে ওই মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী বোমার আঘাত সিটওয়েলকে ক্যাথলিক ধর্মের আশ্রয় নিতে প্ররোচিত করেছিল কিনা। শিবনারায়ণ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রসঙ্গটিকে 'অবোধ্য' বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি এডিথ সিটওয়েলের মধ্যে অনিবার্যভাবে জড়িত। এডিথের যে-চিঠিটি শিবনারায়ণের প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও শিবনারায়ণের এক্স্প্লোরেশন্স্ নামক গ্রন্থটিকে সিটওয়েল প্রকারান্তরে গভীরভাবে 'ধর্মীয়' সাহিত্য বলেছেন। জার্মানি রোমান্টিক কবিদের পুরোধা নোফালিসের দোহাই দিয়ে সিটওয়েল বলেছেন, যা মর্মকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তা-ই ধর্ম-বিষয়ক। তাহলে কি মহৎ সাহিত্য মাত্রেই ধর্মীয় সাহিত্য? প্রশ্নটি শিবনারায়ণের এই মহৎ প্রবন্ধের আড়ালে লুকিয়ে আছে। হয়তে শিবনারায়ণের মনের পেছনেও এই বিষয়ে রহস্য আছে, তা না হলে তিনি সিটওয়েলের পুরো চিঠিটি তুলে দিলেন কেন? অমিয় চক্রবর্তী যে একটি চিঠিতে শিবনরায়ণকে 'আস্তিক' বলে চিহ্নিত করেছেন তারও উদ্ধৃতি আছে এই গ্রন্থে।

সাহিত্যের বা শিল্পের সত্য আর ধর্মীয় সত্য আর ধর্মশাস্ত্রের বা সম্প্রদায়ের সত্য— সব রকম সত্যিই কি এক? এই প্রশ্নের সম্মুখেও শিবনারায়ণকে অসহায় বলে মনে হয়। প্রথম পর্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্রের মনন, উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং ভাষা শিবনারায়ণকেও অভিভূত করে, কিন্তু তিনি বিভ্রান্ত হয়ে যান অন্তিম পর্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ববাদে। তাই দেখতে পাই 'শেষ পর্যন্ত তাঁর কাম্য ছিল মানবপ্রজাতির কল্যাণ'। এই ঘোষণার পরে শিবনারায়ণ একই অনুচ্ছেদে লেখেন 'তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্বের প্রধান প্রবক্তা হয়ে ওঠেন'। বঙ্কিমচন্দ্রের মৌল বিবর্তনকে একটি রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলে দেখব যে ওই রেখা প্রথমটাতে উর্ধ্বমুখী, তার পরে অর্ধচন্দ্রের আকারে বক্র হয়ে অধোমুখী। 'এই বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি এবং বিশ শতকের ভারত-ইতিহাসেরও ট্রাজেডি বটে।' এই একটি ট্র্যাজেডিকে শিবনারায়ণ উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু অপর একটি ট্রাজেডির উল্লেখ করেননি। যেহেতু অধিকাংশ বাংলাভাষী ধর্মে অহিন্দু তাই তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা বা কতটুকু সমাদর পাবেন! বঙ্কিমচন্দ্র কি বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে মুষ্টিমেয় বাংলাভাষীর কাছে গ্রহণীয়রূপে নাকি হিন্দুত্বের প্রবক্তারূপে ভারতের বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়ে কাছে বরণীয়রূপে বেঁচে থাকবেন? স্বকালের প্রসঙ্গরূপে একটি অত্যন্ত জরুরি প্রবন্ধ হল 'আধুনিকতা, নারীমুক্তি ও নির্মীয়মান সমাজবিপ্লব'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল যে আমরা মা জলপাইগুড়িতে ডাক্তার ছিলেন এবং শহরবাসীদের একাংশ মনে করতেন যে ডাক্তারি মহিলাদের জন্য নয়, পুরুষদের জন্য পেশা। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ওই মানসিকতার পরিবর্তন অনুভব করি। জানতাম না যে টমাস পেইন যখন রাইটস অব ম্যান লেখেন তখনই মেরি ওয়লস্টোনক্রাফট প্রথমে ফরাসি বিপ্লবের সমর্থনে এ ডিভিকেশন অব দ্য রাইর্টস অব উওম্যান লেখেন। তাঁর অপর গ্রন্থ হিস্টরিক্যাল অ্যান্ড মর‍্যাল ভিউ অব দ্য অরিজিন অ্যান্ড প্রগ্রেস অব দ্য ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে ১৭৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই মেয়ে মেরি শেলী লেখেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামক উপন্যাস যা আত্মধ্বংসী মানুষের প্রতীক কাহিনীরূপে বিশ্ববিখ্যাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিস্মৃত মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফট প্রথমে ফরাসি বিপ্লবের সমর্থনে এ ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইর্টস অব উওম্যান লেখেন। তাঁর অপর গ্রন্থ হিস্টরিক্যাল অ্যান্ড মর‍্যাল ভিউ অব দ্যা অরিজিন অ্যান্ড প্রগ্রেস অব দ্য ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই মেয়ে মেরি শেলী লেখেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামক উপন্যাস যা আত্মধ্বংসী মানুষের প্রতীক কাহিনীরূপে বিশ্ববিখ্যাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিস্মৃত মেরি ওয়লস্টোনক্রাফট বিংশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত হন এবং আজ তাঁকে বাদ দিয়ে মানুষের, বিশেষত নারীর, মুক্তি সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই হতে পারে না। আমাদের দেশে নারীর অধিকারের দাবি প্রথম তুলেছিলেন রামমোহন, পরে ডিরোজিয়োর ছাত্রবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ। তবে এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজি রচনাগুলির সঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাগুলির মধ্যে যুক্তি-বিন্যাসে ও শব্দ-নির্বাচনে যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায় সে বিষয় শিবনারায়ণ নীরব। তিনি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে নারীমুক্তির প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন রোকেয়া খাতুন অর্থাৎ বেগম রোকেয়া হোসেনের উপরে। তাঁর বিবরণ অবশ্যই অসম্পূর্ণ ও খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁর উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ কেউ নিশ্চয়ই নারীমুক্তির প্রসঙ্গে বিস্তৃততর ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রসর হবেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসঙ্গেতত্ত্ব-তর্কের পাশাপাশি স্মৃতিচর্চা এই গ্রন্থে ফিরে ফিরে এসেছে এবং সেই সূত্রে শিবনারায়ণ বারবার নিজের ব্যক্তিস্বরূপকে অবলোকন ও অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। এই সূত্রেই তিনি সমকালীন দুজন অগ্রণী বাঙালি কবির দর্পণ নিজের ও পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করেছেন। এই দুজন কবি হলেন সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী। পরিমাণের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যে খুবই সীমাবদ্ধ। তিরিশের দশকে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব, বারো বছর পরে সহসা প্রস্থান, দশ বছর অজ্ঞাতবাস, তার পরে প্রত্যাবর্তন ও সাত বছর অজ্ঞাতবাস, তার পরে প্রত্যাবর্তন, ও সাত বছর পরেই চিরবিদায়। মধ্যের দশ বছর শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বাঙালি জীবনেরও বাইরে ছিলেন। স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কিন্তু সঙ্গপ্রিয়, বিষাদগ্রস্ত কিন্তু 'মনুষ্যধর্মে' বিশ্বাসী, সুদুর কিন্তু সহৃদয়। মধুসূদনের মতো এই দত্তকুলোদ্ভব কবিও বাংলা সাহিত্যের একজন কবি এবং সাহিত্যের বাইরে সংঘটিত এক নাটকের প্রধান চরিত্র, উপন্যাস বা নাটকের নায়ক হওয়ার উপযুক্ত। তেমন কোনও সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কিছু উপাদানে শিবনারায়ণের প্রবন্ধটি মূল্যবান। সুধীন্দ্রনাথের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে, যখন বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদী আন্দোলন করছেন তখন সুধীন্দ্রনাথ রণক্ষেত্রে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে শেষে ভারত সরকারের এ আর পি-তেই যোগ দেন। আরও কিছু তথ্য আছে প্রণয় ও বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহের কাছে আত্মসমর্পণের বেদনা-বহনের ধৈর্যশীলতা সম্পর্কিত। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে 'শূন্যবাদী, সোহংবাদী, অনেকান্তবাদী ও অনাত্মবাদী' বলে শিবনারায়ণ অভিহিত করেছেন, কিন্তু মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করেননি। লিখেছেন বটে, 'একমাত্র না হলেও তিনিই প্রধান বাঙালি কবি যাঁর ক্ষেত্রে মনন এবং আবেগ পরস্পরের অনুস্যূত', কিন্তু উক্তিটিকে ব্যাখ্যা করেননি। কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ গভীরভাবে জিজ্ঞাসু ছিলেন, এই জিজ্ঞাসু থেকে গদ্যে বহু আলোচনা লিখেছেন এবং নিশ্চয়ই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলিতেও বহু কথা বলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে যদি বহু স্মৃতিকথাও লেখা থাকে তা হলে ভবিষ্যতে তাঁর কাব্যের মূল্য নির্ণয়ে সেসব কথা মূল্যবান উপাদান রূপে গ্রাহ্য হবে। সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শিবনারায়ণের প্রবন্ধটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালি সাহত্যিকের ভিতরে সব চাইতে মননদীপ্ত, হৃদয়বান এবং অভিজাত পুরুষ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।'

শিবনারায়ণ অপর যে-কবির দর্পণে নিজের প্রতিফলন দেখেছেন তিনি অমিয় চক্রবর্তী। অথচ সুধীন্দ্রনাথ আর অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে অসেতুসম্ভব ব্যবধান। তিরিশের দশকেই এডিথ সিটওয়েলের প্রচারে নেমেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, তবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেকার সিটওয়েলের সঙ্গে অমিয়রই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। যেমন রচনার শৈলীতে তেমনই চিত্রকল্পের নির্মাণে। দুজনেরই কবিতার সূত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আবার সিটওয়েল, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় তিনজনেই এক ও অখণ্ড ভুবনচেতনায় সংবৃত। এঁদের মধ্যে অমিয় একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ভাবনায় বিদগ্ধ। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপক পরিক্রমার পরে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করতে এলেন তখন শিবনারায়ণও শান্তিনিকেতনবাসী, প্রায়ই যেতেন অমিয় সকাশে। সাহিত্য নয়, বিশ্ব-পরিস্থিতি নয়, গান্ধী-দর্শনও নয়, তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল আধিভৌতিক। ''সেই কোটি কোটি বছর আগেকার নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ধাপে ধাপে নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অবশেষে সৃষ্টিধর্মী মনুষ্যচেতনার উদ্ভব কি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শূন্য বিলীন হয়ে যাবার জন্য? পঞ্চভূত ফিরে যাবে পঞ্চভূতে, কিন্তু শরীরধৃত যে-চেতনা সেই বিচিত্র উপাদানকে ধারণ করেছিল সেই চেতনাও কি চিরতরে নির্বাপিত হবে? এই উত্তরহীন প্রশ্ন তাঁর কল্পনাকে ধারণ করেছিল সেই চেতনাও কি চিরতরে নির্বাপিত হবে? এই উত্তরহীন প্রশ্ন তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত।''

সন্দেহ করি এই প্রশ্ন শিবনারায়ণের চৈতন্যকেও মধ্যে মধ্যে উদ্দীপ্ত করে। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ স্বকাল স্বজন সমগ্র গ্রন্থটাই পাঠকের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে পাঠকের মনে অজস্র প্রশ্নের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে চিন্তাকে জাগ্রত করার একটি প্রক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে এই গ্রন্থ বিভিন্ন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাবলির সংকলন, কিন্তু গভীরতর স্তরে তেরোটি প্রবন্ধই একটি সূক্ষ্ম সূত্রে সুগ্রথিত এবং এই সুত্রটিই হল স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা। অতএব এটি আদতে নানা পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি মাত্র বিষয়ের উপর একটি সুসংহত গ্রন্থ।